ছাত্র রাজনীতি : পক্ষে-বিপক্ষে

আজম জহিরুল ইসলাম

| ঢাকা , বুধবার, ২৩ অক্টোবর ২০১৯

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শেরেবাংলা হলের মেধাবী ছাত্র আবরার হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে। অনেকেই পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে বেশিরভাগ মানুষই চায় ছাত্র রাজনীতি বহাল থাকুক। তাদের দাবি, ছাত্র রাজনীতি না থাকলে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হবে না। তারা অতীতের আদর্শিক ছাত্র রাজনীতি ও এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেছেন, সে সময় যত ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তার সবই ছিল সফল। তার মধ্যে ’৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ’৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধসহ সর্বশেষ ’৯০-এর স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলন অন্যতম। মূলত এসব আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিল ছাত্রসমাজ। ছাত্রসমাজ শরিক হয়েছিল বলেই প্রত্যেকটি আন্দোলন-সংগ্রাম আলোর মুখ দেখেছিল। সে হিসেবে ছাত্র রাজনীতি বহাল থাকুক তা অনেকেই চায়। তবে তখনকার প্রেক্ষাপট ও আজকের প্রেক্ষাপটের মধ্যে অনেক তফাৎ।

দেশের ঐতিহ্যবাহী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নেই। নেই অস্ত্রের ঝনঝনানি, মারামারি ও হানাহানি। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি ও পদবাণিজ্য, হল দখল ইত্যাদিরও দেখা মেলে না। সেশনজটের অত্যাচার থেকে মুক্ত বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীরা। এ বিষয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ভিসিরা শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করান। কিন্তু সে শপথ আজও ভাঙেনি সুন্দর জীবনের স্বপ্নচারী শিক্ষার্থীরা। তবে যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা সোচ্চার। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে কোনো স্লোগান নেই। ভবন ও দেয়ালগুলোতে নেই কোনো দলীয় স্লোগান ও কারও বাণী। শিক্ষক রাজনীতি ও দলীয় লেজুড়বৃত্তিও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। এটি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর জন্য একটি বড় ধরনের মেসেজ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিপি ও সাবেক জিএস যারা দক্ষতা ও সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন ছাত্র রাজনীতি নিয়ে অনেক কথাই বলেছেন তারা। তাদের মধ্যে ডাকসুর সাবেক ভিপি আ স ম আবদুর রব, তোফায়েল আহমেদ, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, আমান উল্লাহ আমান, মাহমুদুর রহমান মান্না, ডাকসুর সাবেক জিএস ডা. মুশতাক হোসেন, জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু অন্যতম। তারা প্রায় অভিন্ন সুরেই বলেছেন, ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করলে যোগ্য নেতৃত্ব পাবেন কোথায়? ছাত্র রাজনীতির কারণেই

ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন সফল হয়েছে। ছাত্র রাজনীতি ছিল বলেই মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যাবে না। তবে স্বাধীন ধারার ছাত্র রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনে থাকতে হবে। এটা করতে না পারলে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তারা আরো বলেন, ছাত্র রাজনীতি আজ ফ্যাসিস্ট দখলদারিত্বের দ্বারা আক্রান্ত। এই সুযোগ নিয়ে মহল বিশেষ ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে ‘বিরাজনীতিকরণের’ অস্ত্র প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছে। বুঝতে হবে রাজনীতি ও দলবাজি এক জিনিস নয়। দলবাজি নিষিদ্ধ করা উচিত। ছাত্র রাজনীতির নামে সব শিক্ষাঙ্গনে বছরের পর বছর চলছে সন্ত্রাস আর চর দখলের মতো হল দখল। চলছে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, খুনখারাবি। পচনশীল তথাকথিত এই রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তারা আরো বলেন, বুয়েটে সুস্থ ছাত্র রাজনীতি থাকলে আবরার হত্যাকাণ্ডের শিকার হতো না। যারা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলেন তারা বেশি ভদ্রলোকি মনোভাব দেখান।

এদিকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, ছাত্র সংগঠন তথা শিক্ষাঙ্গনের ওপর দুর্বৃত্তায়িত অসুস্থ রাজনৈতিক প্রভাবের নিষ্ঠুর পরিণতি। দলীয় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাপুষ্ট সংগঠনের সব কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের যে গৌবরোজ্জ্বল অতীত ও অবিস্মরণীয় ভূমিকা তাকে ম্লান করে দিচ্ছে ছাত্র সংগঠনের ওপর

দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির নিষ্ঠুর প্রভাব। আশা করি রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্বশীল অংশ আমাদের এই উৎকণ্ঠার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারবেন, অনুতপ্ত হবেন।

অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক সৈয়দ মঞ্জুজরুল ইসলাম বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে খুনখারাবি বন্ধ করতে চাইলে মূল জায়গায় যেতে হবে। এখন যা চলে পথভ্রষ্ট রাজনীতি। এখন তাদের উদ্দেশ্য অর্থ ও প্রতিপত্তি। আর বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছে রাজনীতির জায়গা। শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। উপচার্যরা সরাসরি সরকারি দলের। সরকারি দলের শিক্ষকরা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের ভূমিকা পালন করেন। আর প্রক্টর পালন করেন সরকারি পুলিশ কর্তকর্তার ভূমিকা। এদের আর রাজনৈতিক অঙ্গসংগঠনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। পুলিশ যদি আইনশৃঙ্খলার যথাযথ ভূমিকা পালন করতো তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটতো না।

স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ১৫১ জন শিক্ষার্থী। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলিতে ৭ শিক্ষার্থী প্রাণ হারায়। এ ঘটনার ৪ বছর পর শফিউল আলম প্রধানসহ অন্য অভিযুক্তদের আদলত সাজা দেন। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তারা মুক্তি পেয়ে যান। সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সেখানে হত্যার শিকার হয়েছেন ৭৪ জন। এমন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ জন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ জন, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন, হযরত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন করে শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনার আজও কোনো বিচার হয়নি। যে কয়টি মামলার রায় হয়েছে তার বেশিরভাগ আসামিই ছিল লাপাত্তা।

শুধু শিক্ষার্থী হত্যাকাণ্ড নয়, গত ৭ বছরের ২৮২ জন শিক্ষার্থী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। চরম ভয়ভীতির কারণে এতদিন নির্যাতিত শিক্ষার্থীরা মুখ না খুললেও আবরার হত্যাকাণ্ডের পর মুখ খুলতে শুরু করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলের গেস্টরুম ও রাজনৈতিক অফিসগুলো সাধারণ ছাত্রদের কাছে এক মূর্তিমান আতঙ্কের নাম। এসব কক্ষ ব্যবহার হয় ‘টর্চার সেল’ হিসেবে। গত ৭ বছরে ছাত্রদের আবাসিক হলগুলোতে ৯২টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসী ক্যাডাররা। এতে নির্যাতনের শিকার হন ২৮২ জন শিক্ষার্থী।

মোটকথা, ছাত্র রাজনীতি বহাল থাকুক এটা সবাই প্রত্যাশা করে। নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন, আবাসিক হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের সমস্যা, উন্মুক্ত ক্যাম্পাস, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, ছাত্র অধিকার বাস্তবায়নসহ অন্যান্য জরুরি

ইস্যুগুলো নিয়ে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করবে। কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করবে না কোনো ছাত্র সংগঠন। কোনো রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আনা কিংবা ক্ষমতায় বসানো নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো মাথা ঘামাবে না। তাদের হতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ। হলে হলে তাদের দলীয় অফিস থাকবে, কিন্তু 'টর্চার সেল' থাকবে না। কোনো শিক্ষার্থী অপরাধ করলেও তাৎক্ষণিত তাদের শাস্তি দেয়া যাবে না। সেজন্যে ভিসি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছেন। তারাই বিষয়টি দেখভাল করবেন। কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পড়ানো বাদ দিয়ে রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, দলীয় নেতাদের মতো আচরণ করবেন সেটি হতে দেয়া যাবে না। ছাত্র নেতারা রাজনীতির নামে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি ও পদবাণিজ্য, হল দখল, মাদক সেবন, মাদক বিক্রিসহ অন্যায় কোনো কাজে জড়িত হতে পারবেন না।

অবশ্য সুদূর অতীতে ছাত্রসমাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল এটা যেমন সত্য, তেমনি তাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম সফলতা লাভ করেছিল সেটিও অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব ছাত্র আন্দোলন ও তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গৌরব-দীপ্ত। স্বাধীনতা-উত্তরকাল বিশেষ করে পঁচাত্তর-পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতির সেই ধারাবাহিকতা বহমান থাকে। পঁচাত্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর

থেকে ছাত্র রাজনীতি কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ে এবং তার অতীত-ঐতিহ্য হারায়। সততা ও আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে ছাত্রনেতারা টাকার পেছনে ছুটে চলে। অনেকেই রাতারাতি কোটিপতি বনে যান। তারা দামি গাড়িতে চড়েন, দাপটের সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান। ক্ষমতার অপব্যবহার করে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি ও পদবাণিজ্য, হল দখল, ছাত্র নির্যাতনসহ এমন কোনো গর্হিত কাজ নেই তাদের দ্বারা সম্পন্ন হয় না। তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ সাম্প্রতিক বুয়েটের শেরেবাংলা হলে নিষ্ঠুর আবরার হত্যাকাণ্ড।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে। কোনো বিবেকবান মানুষ তথাকথিত নোংরা ছাত্র রাজনীতি সমর্থন করে না। বিশেষ করে সাধারণ ছাত্রসমাজও নষ্ট ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তারা দাবি তুলেছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হত্যা, নির্যাতন ও ছাত্র স্বার্থবিরোধী নোংরা রাজনীতি নিষিদ্ধ করো। যে রাজনীতি ছাত্রদের নিরপত্তা দিতে পারে না, যে রাজনীতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করে, মারতে মারতে মেরে ফেলে, যে রাজনীতি চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি শেখায়, যে রাজনীতি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে না, সে রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনে থাকা উচিত নয়। আজকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে ছাত্র রাজনীতি নেই। সেখানে এখন আর লাশ পড়ে না, কোনো শিক্ষার্থী নির্যাতনের শিকার হয় না। কোনো চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হল দখল,

ভর্তি ও পদবাণিজ্য ও সেশন জট নেই। শিক্ষক রাজনীতিও সেখানে অচল। অস্ত্রের ঝনঝনানি, মারামারি-কাটাকাটিও উধাও। সুন্দর পরিবেশে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতারা বলেছেন, এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ছাত্র আন্দোলনের সূতিকাগার। এখান থেকেই সমস্ত আন্দোলনের অগ্নিশিখা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলত। যৌক্তিক আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিত গোটা ছাত্রসমাজ। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরাও সে আন্দোলনে শরিক হয়ে ছাত্রদের সহযোগিতা দিতেন। কিন্তু আজকে ছাত্র আন্দোলন বা ছাত্রনেতাদের যে কদর্য চেহারা, তা দেখে মানুষ বিস্মিত, স্তম্ভিত। মানুষ আজ ঘৃণার চোখে দেখছে ছাত্র রাজনীতি। ছাত্র রাজনীতি এখন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় ও ছাত্র-অধিকার জলাঞ্জলি দিয়ে নেতারা এখন দামি গাড়িতে চড়েন। হলে হলে ‘টর্চার সেল’ বানিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদান করেন। আরাম-আয়েশে জীবন চালাতে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তি ও পদবাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অতীতে এ বিষয়গুলো চোখে পড়তো না। যার কারণে আবরার হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনাগুলো একের পর এক সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চলমান এসব ঘটনার কোনো বিচার হচ্ছে না। ক্ষমতাসীন সরকারগুলো ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোকে ‘লাঠিয়াল বাহিনী’ হিসেবে ব্যবহার করছে। এ সুযোগে ছাত্র

নেতারাও নিজেদের আখের ঘোচানোর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। আজকে অনেকেই বলেছেন, মাথা ব্যথার জন্য মাথা কাটা যাবে না। প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মাঝে চালাতে হবে শুদ্ধি অভিযান। সুস্থধারার রাজনীতি চালু করতে হবে। কিন্তু ঘুরেফিরে সেই একই প্রশ্নই আসে, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কে ছাত্রদের মাঝে সুস্থধারার রাজনীতি ফিরিয়ে আনবে? যেখানে মূল রাজনীতিতেই গণতন্ত্রের চর্চা নেই, সেখানে ছাত্র সংগঠনগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা সুস্থ রাজনীতিচর্চা চিন্তা করা বোকার স্বর্গে বসবাসেরই নামান্তর। রক্তে ক্যান্সারের বীজ প্রবেশ করলে রক্ত বদলানো যেমন জরুরি, তেমনি দূষিত ছাত্র রাজনীতিকেও (আপাতত) বাদ দেয়া আজ জরুরি হয়ে পড়েছে; যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা প্রকৌধশল বিশ্ববিদ্যালয়। এখন যা অনুসরণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢেলে গাছ বাঁচানো যেমন সম্ভব না, তেমনি ছাত্র রাজনীতির আমূল পরিবর্তন ছাড়া কয়েকজন ছাত্রকে শাস্তি দিলেই সুস্থধারার রাজনীতি ফিরে আসবে না।

[লেখক : সাংবাদিক, নাট্যকার, ছড়াকার]